ষষ্ঠ বর্ষ | সেপ্টেম্বর, ২০০৫ | প্রথম সংখ্যা

মহাবিশ্ব ও আমি

সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স, কলকাতা

সম্পাদকীয়

মহাকাশ বিজ্ঞানের বিভিন্ন জটিল তত্ত্বকে সাধারন মানুষের কাছে বাংলা ভাষাতে বোঝানোর চেষ্টা করাই 'মহাবিশ্ব ও আমি'র উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যের দিকে আরো একধাপ এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে প্রকাশিত হল 'মহাবিশ্ব ও আমি'র ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম সংখ্যা।

এই সংখ্যা শুরু হয়েছে এক অভিনব প্রবন্ধ দিয়ে যাতে মহাকাশ ভ্রমন এবং মহাকাশে বসবাস নিয়ে বলা হয়েছে। প্রচ্ছদেও স্থান পেয়েছে দুজন মানুষের মহাকাশ ভ্রমনে যাবার কাল্পনিক চিত্র দিয়ে। ধারাবাহিক প্রবন্ধ 'মহাবিশ্বে প্রান'র তৃতীয় সংখ্যা। প্রাচিন ভারতবর্ষ জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চায় প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিলো সে বিষয়ে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বলা হয়েছে। এটি একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধ। এছাড়াও ডার্কম্যাটার, হাবলের ধ্রুবক ও সবশেষে ধারাবাহিক প্রবন্ধ শনি অভিযান দিয়ে এই সংখ্যাটির পরিসমাপ্তি করা হয়েছে। আশাকরি প্রতিবারের মত এই সংখ্যাও বিজ্ঞানপ্রেমী মানুষের কাছে সমাদর লাভ করবে।

এই সংখ্যাটির প্রকাশে সেন্টার ফর ফিজিক্সের সম্পাদক অধ্যাপক সন্দীপ চক্রবর্ত্তী বিশেষ ভাবে সহায়তা করেছেন। ঋতব্রত, ইন্দ্রজিৎ, অঙ্কন বিভিন্ন ভাবে সহায়তা করেছেন। রচনাগুলি সহজবোধ্য করার জন্য বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে কিছু ছবি সংযোজন করা হয়েছে, তাঁদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা বিভাগ ও Indian Space Research Organisation (ISRO) র আর্থিক সাহায্যে এই সংখ্যাটি প্রকাশ পেয়েছে।। তার জন্য সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্সের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

কিংশুক আচার্য্য

সূচীপত্র

1. আমাদের কথা 2
2. মহাকাশ ভ্রমণ এবং মহাকাশে বসবাস - অঙ্কন দাস 3
3. মহাবিশ্বে প্রাণ - ৩ - ড: সোনালী চক্রবর্তী 6
4. প্রাচীন ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা (১) - পার্থ সারথি পাল 8
5. ডার্ক ম্যাটার ও মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ - কাকলি সরকার 10
6. শনি অভিযান -১ - কিংশুক আচার্য্য 12
7. হাবলের ধ্রুবক - অধ্যাপক সন্দীপ চক্রবর্তী 16

প্রথম মুদ্রন:- সেপ্টেম্বর, সন ২০০৫

কিংশুক আচার্য্য দ্বারা সম্পাদিত ও সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স, ৪৩ চলন্তিকা, গড়িয়া স্টেশন রোড, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৮৪

কভার ডিজাইন:- কিংশুক আচার্য্য

প্রচ্ছদ পট :- মহাকাশ ভ্রমনে মানুষ

আমাদের কথা

ইন্দ্রজিৎ লাহা
সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স

বিজ্ঞানে উৎসাহী পাঠকবৃন্দের জন্য আমাদের এই পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষের উপনীত হল। মহাকাশ বিজ্ঞান বিজ্ঞানের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। সুপ্রাচীনকাল থেকে বহু বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌দের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজ মহাকাশ বিজ্ঞানের অনেক অজানা তথ্য জানা সম্ভবপর হয়েছে। ক্রমাগত গবেষণার ফলে ভবিষ্যতে আরও অনেক নতুন নতুন তথ্য জানা যাবে।

কলকাতার সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স গত ছয় বছর যাবৎ অনলস প্রচেস্টা করে আসছে বাংলার মাধ্যমে সাধারন মানুষের কাছে মহাবিশ্বের রহস্য পৌঁছে দেওয়ার। এই প্রচেষ্টার মধ্যে পরে বাংলায় জিলা ভিত্তিক মহাকাশের উপর সেমিনার করা। প্রত্যেক বছর দুটি করে জিলায় এই সেমিনার হয়। সেই সময় এই পুস্তক সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই সেন্টারের বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের অনেক সময় ব্যয় করে ইংরেজী শব্দের যথাযথ বাংলা প্রতিশব্দ বার করতে। তবুও আমাদের মনে হয় অনেক ভূল থেকে গিয়েছে। তাঁর জন্য মার্জনা চাইছি।

এই পত্রিকাটি প্রকাশ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এবং ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞান গবেষণা বিভাগ (Indian Space Research Organization) আমাদের আর্থিকভাবে সহায়তা করেছেন। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

মহাকাশ ভ্রমণ এবং মহাকাশে বসবাস

অঙ্কন দাস

সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স, কলকাতা

অজানাকে জানার তাগিদে মানুষ্যের অনুসন্ধিৎসু মন ছুটে বেড়ায় দিক থেকে দিগন্তে। আমরা যখনি সময় পাই আমাদের ভ্রমনপিপাসু মন কে শান্ত করতে বেরিয়ে পরি দিক্ দিগন্তে। কেউ হয়তো পছন্দ করেন সমুদ্র, কেউ বা পাহাড়, কেউ বা জঙ্গল আবার অনেকে আছেন যারা পছন্দ করেন শুধু মাত্র নৈসর্গিক সৌন্দর্য। কিন্তু বর্তমানে মানুষ এতটাই তথ্যপ্রযুক্তিগত ভাবে উন্নত যে তাদের কে আর কোনো গন্ডির মধ্য বেঁধে রাখা সম্ভব নয় তাই ভ্রমনপিপাসু মানুষের এখন আর একটি ভ্রমনস্থল হল 'মহাকাশ'। অবাক লাগলেও কথাটা সত্যি, এখন আমাদের কাছে মহাকাশ ভ্রমণ আর কোনো অলীক কল্পনা নয়। আমার আপনার মতো মানুষও চাইলে হতে পারেন মহাকাশের সওয়ারী যদি সাথে থাকে যথোপযুক্ত পুঁজি। ব্যাপারটা এখন অনেকটা টিকিট কেটে ঘুরতে যাওয়ার মতোই হয়ে দাড়িয়েছে।

মহাকাশ গবেষনায় প্রাথমিক সাফল্যর পর থেকেই আমাদের সপ্ন দেখার শুরু। ছোটোবেলায় কল্পবিজ্ঞানের চরিত্র গুলির সাথে আমরা একাত্ম হয়ে যেতাম, ভাবতাম আমরাই বুঝি ঘুরে বেরাচ্ছি মহাকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে, চলে যাচ্ছি চাঁদে যখন তখন, যুদ্ধ করছি বাইরের জগৎ এর কোনো প্রাণীদের সাথে। এ ব্যাপারে দু একটি বই এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে যেমন জুলে ভার্ণ এর লেখা 'From Earth to the Moon & around the Moon', সি. ক্লার্ক এর লেখা 'Fall of Moondust' ইত্যাদি। ছোটোবেলার সে সমস্ত সপ্ন আজ বাস্তব।

মহাকাশ গবেষণায় সোভিয়েত রাশিয়ার অবদান অনস্বীকার্য। মহাবিশ্বে সর্ব প্রথম উড়ে বেরানোর কৃতিত্ব সোভিয়েত রাশিয়ার দখলে। প্রথম পুরুষ মহাকাশচারী হলেন ইউরি গ্যাগারিন যিনি 1961 সালে মহাকাশে পাড়ি দেন এবং ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা 1963 সালে প্রথম মহিলা মহাকাশচারী হিসাবে মহাকাশে পাড়ি দেন, ওনারা দুজনেই হলেন রাশিয়ান। এর পর বহু মানুষ পাড়ি দিয়েছেন মহাবিশ্বে কিন্তু সেটি পুরোটাই গবেষণার কারনে। সেদিক থেকে দেখতে গেলে তোহিরো আকিয়ামা হলেন প্রথম মানুষ যিনি গবেষণার উদ্দেশ্য ছাড়াও কিছু ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য নিয়ে মহাকাশে পারি দেন। আকিয়ামা হলেন একজন জাপানী reporter, ওনাকে কিছু রাশিয়ান এবং জাপানী কোম্পানীর যৌথ উদ্দোগে 1990 সালে মহাকাশে পাঠানো হয়। মহাকাশে রাশিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য স্পেস স্টেশানের নাম হল 'MIR', আকিয়ামাকে একটি মহাকাশযান ওই স্টেশানে ছেড়ে আসে, ওখানে তিনি বহু দিন থাকেন এবং দৈনিক TV তথ্য সম্প্রচার করেন এছাড়াও তিনি কিছুকিছু পরীক্ষা নীরীক্ষাও করেন। এখান থেকেই একটি নতুন আধ্যায়ের জন্ম হয়। MIR স্পেস স্টেশানটি দেখাশুনার দায়িত্বে ছিলেন MIRCORP নামে একটি কোম্পানী। তারা এর পর চিন্তা ভাবনা করে দেখেন MIR স্পেস স্টেশানের বিপুল ব্যায়ভার বহন করতে হলে কিছুটা ব্যবসায়িক রাস্তা নেওয়া দরকার। এই ভাবনার প্রথম স্বীকার হলেন আমেরিকার কোটিপতি ডেনিস টিটো, উনি $20,000,000 দিয়ে মহাকাশভ্রমণের সর্ব প্রথম টিকিটটি কাটেন। টিটো 2001 সালের 28 এপ্রিল 7 দিনের জন্য ইনটারন্যশানাল স্পেস স্টেশান (ISS) পরিদর্শন করেন। এর পর 2002 সালে দক্ষিন আফ্রিকার কোটিপতি মার্ক সাটেলওয়ার্থ দ্বিতীয় ব্যাক্তি হিসাবে মহাকাশ ভ্রমণ করেন। এর পর গ্রেগরি ওলসেন মহাকাশ ভ্রমণ করেন 2005 সালে, উনি ISS এ ভ্রমণের সময় তার কোম্পানীর পক্ষ হতে কিছু পরীক্ষা নীরীক্ষাও চালান।

এখন মহাকাশ ভ্রমণ হল একটি লাভজনক ব্যবসা। বহু বড় বড় কোম্পানি এখন এর বাজার ধরার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এখেত্রে কিছু নাম উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন Space Adventures, Virgin Galactic, Starchaser, Blue Origin, Armadillo aerospace, Rocket Plane Ltd. ইত্যাদি। এদের প্রত্যেকরই নিজস্ব কিছু কিছু ভ্রমণ package আছে। প্রত্যেকেই চাইছে একে অপরকে টেক্কা দিতে। এদের সবারই মুল উদ্দেশ্য ভ্রমণকারীকে মহাকাশ ভ্রমণের মাধ্যমে যথোপযুক্ত আনন্দ দেওয়া। এরা মহাকাশযানে করে ভ্রমণকারীকে এমন একটি উচ্চতায় নিয়ে যেতে চায় যেখানে ভ্রমণকারী কিছুক্ষনের জন্য নিজেকে ভারশুন্যতা উপলব্ধি করতে পারে এবং সেখান থেকে দুচোখ ভরে পৃথিবীকে দেখতে পারে। পৃথিবীর বাইরে থেকে পৃথিবী কে দেখতে কেমন লাগে তা আমরা

কেবল দুরদর্শনের পর্দাতেই দেখেছি বিভিন্ন satellite এর তোলা ছবি থেকে। এই ভ্রমণের মাধ্যমে মানুষ চাক্ষুষ করতে পারবে আমাদের প্রিয় পৃথিবীকে।

মহাকাশ ভ্রমণের ব্যবসায় কিছুটা রাশ টানার জন্য আমেরিকা সরকার কিছু আইন কানুন প্রয়োগ করেছেন। এটি প্রয়োগ করার কারন হলো যাতে কিছু সার্থ্যান্বেসী মানুষ এটির অপব্যবহার না করতে পারে। কারন এটির সাথে জড়িয়ে আছে মানুষের জীবন। তাই কোনো কম্পানিকে অনুমোদোন দেওয়ার আগে যাত্রী সুরক্ষার উপর খুব বেশী করে জোর দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও বহু খুটিনাটি পরীক্ষার পরই মিলছে অনুমোদন পত্র। এই অনুমোদন পত্রটি পাওয়া যায় Federal Aviation Adminstration's Office of Comercial Space Transportation এর পক্ষ হতে।

মহাকাশ ভ্রমনে মানুষ

Virgina Galactic হল মহাকাশ ভ্রমনের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। নিকট ভবিষ্যতে এরাই হতে যাচ্ছে প্রথম কম্পানি যারা মানুষকে মহাকাশে পাঠাতে সক্ষম। এদের Budget অনুযায়ী প্রথম 100 জন ভ্রমণকারীর জন্য খরচ ধার্য্য করা হয়েছে মাথাপিছু $200,000। পরবর্তী পর্যায় 900 জনের জন্য মাথা পিছু খরচ পড়বে $100,000 থেকে $175,000 এর মধ্যে। এর পরবর্তী পর্যায়ের যাত্রীদের জন্য খরচ পড়বে খুবই কম মাত্র $20,000। এরা ভ্রমণকারীকে মহাকাশে নিয়ে যাওয়ার আগে তাদের জন্য একটি 3 দিনের ট্রেনিং এর আয়োজন করেন, এই সময়ের মধ্য তারা যাত্রীকে অভ্যাস করাবে মহাকাশযানে কি ভাবে থাকতে হবে কেমন লাগবে ভারশুন্য অবস্থা এছাড়াও বহু খুটিনাটি জিনিসপত্র। virgina Galactic এর মহাকাশযানটির জনক হলেন অমেরিকার ইন্জিনিয়ার ব্রুট রুটান। এটি 6 জন যাত্রীকে নিয়ে 2.5 ঘন্টা উড়তে সক্ষম। এখনো পর্যন্ত যা ঠিক আছে এটি যাত্রীকে নিয়ে 109.73 km (এই উচ্চতাটিকে বলা হয় পৃথিবী এবং মহাকাশ এর ভিতরের সীমারেখা) উর্ধ্বে যাবে এবং যাত্রীকে ভারশুন্যতা উপলব্ধি করাবে।

এছাড়াও অনান্য কম্পানি গুলি নিজেদের package ঘোষনা করেছেন। যেমন, Constellation Service International (CSI) যারা তাদের pakage এ দিচ্ছে এক সপ্তাহের জন্য ISS এ থাকা এবং এক সপ্তাহ চন্দ্রের চারিদিকে ভ্রমণের। এরা এদের কাজ 2008 সাল নাগাদ শুরু করে ফেলবে বলে আশা করা যাচ্ছে। Space Adventures বলে একটি কম্পানীও চন্দ্রের চারিদিকে ভ্রমণের আয়োজন করছে 2008 - 2009 সাল নাগাদ, এদের ক্ষেত্রে মাথা পিছু খরচ ধার্য্য করা হচ্ছে $100,000,000।

আমেরিকার এক বিরাট কোটিপতি রবার্ট বিগলো 2010 সালে একটি ব্যবসায়িক মহাকাশ কেন্দ্র স্থাপন করতে চাইছেন মহাকাশে, যেটির আয়তন হবে প্রায় 330 cubic meter প্রায় ISS এর মতই (ISS হল 425 cubic

meter)। অন্যান্য কম্পানি গুলিও বসে নেই, Virginia কোম্পানির তরফ থেকে জানানো হয়েছে তারা মহাকাশ এ হোটেল বানাতে চান। Hilton International ঘোষণা করেছে তারাও হোটেল বানাতে চান মহাকাশে। মহাকাশযান গুলি তাদের জ্বালানী হিসাবে যে সমস্ত fuel tanker গুলিকে নিয়ে যায়, একবার ব্যবহার করার পর সেগুলিকে পৃথিবীর দিকে ফেলে দেওয়া হয় যা পৃথিবীতে পৌছানোর আগে আবহাওয়ামন্ডলে জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। এই সমস্ত fuel tanker গুলির এক একটির আয়তন Boeing 747 বিমানের আকারের। Hilton International এই সমস্ত fuel tanker গুলিকে নষ্ট না করে এগুলিকে দিয়ে একটি স্পেস হোটেল বানাতে চান। বিভিন্ন কোম্পানি এসে যাওয়ায় যেটা সুবিধা হয়েছে সেটা হল প্রত্যকে চাইছে যাত্রীকে বেশী সুবিধা দিতে ফলে এখন যাত্রীর সামনে নানা রকম প্যাকেজ রয়েছে যার যেটি সুবিধা তিনি সেটি পছন্দ করতে পারবেন।

এতো গেল মহাকাশে কয়েক ঘন্টা বা কয়েক দিন ঘুরতে যাওয়ার কথা, বিজ্ঞানীদের এর পরবর্তী উদ্দেশ্য হল মহাকাশে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করা। আজ আমরা তথ্যপ্রযুক্তিগত ভাবে এতটা উন্নত হবার পর যদি কোনো কারনে আমাদের সভ্যতার বিনাশ ঘটে, সেটি হবে খুবই দুঃখজনক ব্যপার। তাই বিজ্ঞানীরা চাইছেন আমাদের সভ্যতাটিকে পৃথিবীর বাইরেও ছড়িয়ে দিতে। জানা নেই সেই দিনটি কবে আসবে কিন্তু বিজ্ঞানীরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, হয়তো একদিন আসবে যখন পৃথিবীর বাইরেও প্রচুর মানুষ থাকবে, যায়গাটি হয়তো হতে পারে অন্য কোনো গ্রহ বা গ্রহানুতে অথবা কোনো ধুমকেতু অথবা আমাদের সৌরমন্ডলের বাইরের কোনো স্থল।

মহাকাশে পাকাপাকিভাবে থাকতে হলে অবশ্যপ্রয়োজনীয় জিনিস গুলি হল খাদ্য, শক্তি, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং সর্বপরি বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ। স্পেস কলোনী যদি সত্যি সত্যি তৈরি করা সম্ভবপর হয় তার মধ্যে এই সমস্ত ব্যাপার গুলি থাকতেই হবে। মহাকাশে বিভিন্ন ধরনের radiation আছে যেগুলি আমাদের পক্ষে খুবে ক্ষতিকারক। পৃথিবীতে এই সমস্ত radiation এর হাত থেকে বাঁচায় van Allen belt। সুতরাং স্পেস কলোনী তৈরির যায়গা বাছার সময় এটা দেখাটা খুবে জরুরী যাতে কাছাকাছি একটু বেশী ভরের কোনো গ্রহ বা গ্রহাণু থাকে যে বিভিন্ন আগমান radiation কে টেনে নিতে সক্ষম হয়। যদি থাকার যায়গা হিসাবে আমরা যেমন চাঁদ অথবা মঙ্গল কে পছন্দ করি তাহলে আমাদের প্রাথমিক ভাবে প্রয়োজনীয় local materials গুলো অতি সহজেই পেতে পারি, চাঁদে অক্সিজেন, সিলিকন ছাড়াও ধাতুর মধ্যে লোহা, অ্যালুমিনিয়াম, এবং টাইটেনাম প্রচুর পরিমানে পাওয়া যায়। কিন্তু হাইড্রোজেন, কার্বন এবং নাইট্রোজেনের কিছুটা ঘাটতি দেখা যায়। পৃথিবী থেকে কলোনী তৈরির কাঁচা মাল আমদানী করাটা প্রচুর খরচ সাধ্য ব্যাপার, এককধারে প্রায় অসম্ভব। তাই কাঁচা মাল গুলি পাওয়া যেতে পারে চাঁদ অথবা পৃথিবীর চারিধারে ভ্রাম্যমান গ্রহাণু অথবা ধুমকেতু হতে। মঙ্গলের উপগ্রহ ফোবস এবং ডেমোস হল স্পেস কলোনীর জন্য একটি উপযুক্ত স্থান, কারন এখানে প্রয়োজনীয় সমস্ত মৌল গুলি বর্তমান। এক্ষেত্রে বৃহস্পতির গ্রহাণু ট্রোজানের নামটিও উল্লেখ করা যেতে পারে। এছাড়াও পৃথিবীর কক্ষপথেও গড়ে তোলা যেতে পারে স্পেস কলোনী। এখানে কলোনী করার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল পৃথিবী থেকে এর দুরত্ব খুবই কম, মাত্র এক ঘন্টায় আমরা পৌছে যেতে পারব ওখানে। কিন্তু এর একটি অসুবিধা হল কলোনী তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল এখানে পাওয়া যাবে না তা রপ্তানী করতে হবে চাঁদ হতে। এছাড়াও সম্ভাব্য স্থান হতে পারে গ্রহাণু অথবা ধুমকেতু অথবা আমাদের সৌরমন্ডলের বাইরের কোনো স্থল।

প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান পাওয়া যেতে পারে সূর্য থেকে, সোলার সেল ব্যবহার করে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন করা যেতে পারে। এছাড়াও ভাবা হচ্ছে ভবিষ্যতে এখান থেকে পৃথিবীকেও শক্তির যোগান দেওয়ার। স্পেস কলোনীতে থাকার জন্য দরকার প্রয়োজনীয় হল বাতাস, খাদ্য, বেঁচে থাকার মতো তাপমাত্রা ইত্যদি। পৃথিবীতে একটি জটিল জীবমন্ডল আছে যেটি আমাদের এই সমস্ত সুবিধাগুলি দেয়। আমরা এই ধরনের পরিবেশে ধাতস্থ হয়ে যাওয়ায় বাইরে কোথাও সম্পূর্ণ আলাদা পরিবেশে গিয়ে ধাতস্থ হওয়াটা প্রায় অসম্ভব। তাই আমাদের বেঁচে থাকতে হলে পৃথিবীর মতো একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা অবশ্য প্রয়োজনীয়। এ ক্ষেত্রে আমরা জীবমন্ডল 2 মডেলটি অণুসরন করতে পারি। এটিও একটি জটিল পদ্ধতি। পরীক্ষামুলক ভাবে দেখা গেছে এই ধরনের একটি মানুষ দ্বারা সৃষ্ট জীবমন্ডলের মধ্য যদি 8 জন মানুষকে রাখা যায় তাহলে তারা মোটামুটিভাবে এক বছর বেঁচে থাকতে সক্ষম।

মনুষের বিজয়রথ যে ভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে মনে হয় না খুব একটা বেশী দিন সময় লাগবে এই সপ্নপূরন হতে, আমরা আশা করতেই পারি খুব তাড়াতাড়ি আমরা ঘর বাঁধতে চলেছি পৃথিবী ভিন্ন অন্য কোনো স্থলে। আমাদের ছোটো বেলায় পড়া কল্পবিজ্ঞানের গল্পগুলি সেদিন সত্যি হবে।

মহাবিশ্বে প্রাণ - ৩

ড: সোনালী চক্রবর্তী

সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স, কলকাতা

আমাদের এই পৃথিবী ছাড়িয়ে সৌরমন্ডলের অন্যান্য গ্রহে এমন কি, অন্যান্য তারামন্ডলেও বিজ্ঞানীদের প্রাণের অনুসন্ধান কি ভাবে চলছে তার কিছুটা এই প্রবন্ধের আগের অংশে (মহাবিশ্বে প্রাণ (২), 'মহাবিশ্ব ও আমি', দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা) আলোচনা করেছি। আগেই জানিয়েছিলাম যে মঙ্গলগ্রহ আমাদের প্রায় হতাশ করেছে। 1976 সালের July মাসে প্রথম মঙ্গলের মাটিতে নিরাপদে নামে পৃথিবীর রোবোটিক মহাকাশযান ভাইকিং ১ (Viking 1) । ভাইকিং ১ এর পাঠানো ছবি থেকেই বোঝা গেল যে মঙ্গলপৃষ্ঠ এখন শুধুই ধূ ধূ মরুভূমি। মরুভূমির মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে শুকনো নদী নালার মত লম্বা সরু রেখা। কিন্তু জলের ছিটে ফোঁটাও নেই। অবশ্য মঙ্গলের বায়ুর চাপ এতই কম যে জল থাকলেও তা খুবই তাড়াতাড়ি উবে (evaporate) যাবার কথা। সেই কারণে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে হয়তো এক সময়ে মঙ্গলে জল ছিল। কিন্তু খুব অল্প সময়েই সেই জল শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে। শুধু মাত্র সামান্য বরফ রয়ে গিয়েছে তার মেরু অঞ্চলে।

কোন কোন বিজ্ঞানী আবার মনে করেন যে মঙ্গল পৃষ্ঠের নীচে এখনও প্রচুর পরিমানে জল জমা আছে বরফায়িত অবস্থায়। আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাতের সাথে অথবা অ্যাসটেরয়েডের আঘাতের ফলে মাটি ফেটে সেই জল বাইরে আসে, - নালার সৃষ্টি হয় আবার অল্প সময়েই তা শুকিয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের এই দু'রকম মতের কোনটা সত্যি এখনো নির্দিষ্টভাবে বলা যাচ্ছে না, - গবেষণা চলছে।

ভাইকিং ১ এবং ভাইকিং ২, এই দুই মহাকাশযানেই ছোট মাপের চলমান ল্যাবরেটরি ছিল। রোবোটিক ব্যবস্থায় বেলচা করে মঙ্গলের মাটি নিয়ে সেই পরীক্ষাগারে প্রাণের সন্ধানে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। কোন কোন পরীক্ষা থেকে মনে হয়েছে - ব্যাকটিরিয়া জাতীয় অতি ক্ষুদ্র প্রাণী রয়েছে, আবার কয়েকটি পরীক্ষা থেকে দেখা গিয়েছে যে, যে সমস্ত জটিল যৌগ দিয়ে পৃথিবীর প্রাণীর শরীর গঠিত সেগুলির কোনটিই মঙ্গলের মাটিতে নেই। 1997 সালে মার্কিন মহাকাশযান 'পাথফাইন্ডার' আরও উন্নতমানের গবেষণাগার সমেত মঙ্গলের মাটিতে নেমে প্রাণের সন্ধান করেছে, কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছু পাওয়া যায় নি। বেশীর ভাগ গ্রহবিজ্ঞানীই (Planetologist) এখন মোটামুটি একমত যে কোন এক সুদূর অতীতে প্রাণ থাকার সম্ভবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে না পারা গেলেও এখন মঙ্গলগ্রহ এক মৃত জগৎ। এর বায়ুমন্ডল আমাদের পৃথিবীর তুলনায় 100 গুণ হালকা এবং বেশীর ভাগটাই কার্বন-ডাই-অক্সাইড। দিনের তাপমাত্রা প্রায় 0^{o} F, আর রাতে সেটা নেমে গিয়ে দাঁড়ায় 150^{o} F, যা আমাদের Antartica এর চেয়েও নীচে। মঙ্গলের মেরু অঞ্চল এত ঠান্ডা যে সেখানে জলীয় বরফের সঙ্গে রয়েছে বরফায়িত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের স্তুপ।

মঙ্গলগ্রহে মানুষ জাতীয় প্রাণীর টিকে থাকা কতখানি অসুবিধেজনক সেটা আন্দাজ করার জন্যে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। ধরুন আপনি সেখানে গিয়েছেন এবং ভাবছেন যে আগুণ জ্বেলে কিছু রান্না করে খাবেন। প্রথমেই আপনি আবিষ্কার করবেন যে ওখানে জ্বালানী বলতে কিছুই নেই । মঙ্গলের বুকে এমন কিছুই নেই, আগুণ ধরালে যা জ্বলে উঠবে। জ্বালানী যদি বা থাকত, তাও আগুণ ধরানো যেত না। কারণ বায়ুমন্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ অত্যন্ত কম। শেষ পর্যন্ত আপনি যদি মেরু অঞ্চলের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের বরফ খুঁড়ে কিছুটা জলীয় বরফ জোগাড় করে ইলেকট্রিক হিটারে বসিয়ে গরম করতে চেষ্টা করেন, তাহলে দেখবেন যে বরফ গলে গলে জল হচ্ছে না, সোজাসুজি বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। কারণ মঙ্গলের চাপ এখন এত কম যে জলীয় অবস্থায় জলকে এখানে পাওয়া যাবে না। অতএব বোঝা যাচ্ছে মঙ্গলগ্রহ এখন শুক্‌নো, অত্যন্ত ঠান্ডা, পাথরের টুকরোয় ভরা এক ধূ ধূ মরুভূমি, সেখানে এখন প্রাণ থাকা প্রায় অসম্ভব। এত কিছু সত্ত্বেও কোনো এক সুদূর অতীতে হয়তো মঙ্গলে জীবনের সূচনা হয়েও থাকতে পারে ধরে নিয়ে সেখানে জীব না হলেও জীবাশ্মের অনুসন্ধান এখনো চলছে।

এবার মঙ্গল ছাড়িয়ে আরও দূরে যাওয়া যাক্ । বৃহস্পতি আর শনি দুটিই গ্রহদের মধ্যে কিছুটা অসাধারণ। দুজনেরই সৌরমন্ডলের মত নিজস্ব উপগ্রহমন্ডল রয়েছে। দুটো গ্রহই মূলত হালকা গ্যাসীয় পদার্থ দিয়ে তৈরী, বেশীর ভাগ হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম।

বৃহস্পতির ব্যাস পৃথিবীর তুলনায় 11 গুণ বড়, অর্থাৎ এর আয়তন অন্তত: 11^{3} গুণ বড়। টেলিস্কোপ দিয়ে বৃহস্পতিকে দেখলে যে তার গায়ে হলুদ, খয়েরী, লাল, গোলাপী ব্যান্ড দেখতে পাওয়া যায়, সেটা তার অদ্ভুত আবহাওয়ার কারণে। আমাদের পৃথিবীতে আবহাওয়ার একটাই পর্দা রয়েছে, ট্রোপোস্ফিয়ার (Troposphere) এবং

আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে জলের কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থায় এর Circulation জন্যে। বৃহস্পতিতে আবহাওয়ার তিনটে আস্তরণ দেখা গেছে। সবচেয়ে বাইরে অ্যামোনিয়ার মেঘের আস্তরন, তার নীচে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোসালফাইড, তারও নীচে জল বরফের আস্তরণ। বৃহস্পতি এতই গরম যে সূর্য থেকে যে শক্তি পায় তার দেড়গুণ বিকীরণ করে। বিশাল বড় হওয়া সত্ত্বেও ঘুরপাক খায় খুব তাড়াতাড়ি, 10 ঘন্টায় একবার, সেখানে পৃথিবীর সময় লাগে 24 ঘন্টা মতো।

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর hydrothermal vent এর ভেতরে যেমন প্রাণীর সন্ধান পাওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে মনে করেন, কোন ক্ষুদ্রাকার প্রাণীর সন্ধান বৃহস্পতির মধ্যে পাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। কিন্তু বৃহস্পতির থেকে তার ছোট বড় উপগ্রহগুলির কোনটার মধ্যে প্রাণী থাকার সম্ভবনা অনেক বেশী। এ বিষয়ে বিজ্ঞানীদের সবথেকে বেশী নজর কেড়েছে উপগ্রহ ইউরোপা। ইউরোপা আমাদের চাঁদের চেয়ে আয়তনে সামান্য ছোট এবং ঘনত্ব কিছুটা কম। আলোর বর্ণ বিশ্লেষণ থেকে বোঝা গেছে যে এখানে প্রচুর পরিমানে বিশুদ্ধ জলীয় বরফ রয়েছে। নাসার গ্যালিলিও অরবাইটার থেকে পাঠানো ছবি থেকে বিজ্ঞানীরা ধারণা করছেন যে ইউরোপার ত্বক বেশীর ভাগটাই পাথুরে, সঙ্গে রয়েছে জলীয় বরফের স্তর 100 km. পুরু। প্রচুর পরিমানে জল থাকার জন্যেই বিজ্ঞানীরা এখানে প্রাণ থাকার ব্যাপারে আশাবাদী।

এবার আশা যাক শনির বৃহত্তম উপগ্রহ টাইটানের কথায়। টাইটান আবিষ্কার করেছিলেন বিজ্ঞানী হাইগেনস 1655 খৃষ্টাব্দে। এর আয়তন আমাদের চাঁদের থেকে সামান্য বড়। চাঁদের কোনো বায়ুমন্ডল নেই, কিন্তু টাইটান ঘন বায়ুমন্ডলের আস্তরনে ঢাকা। সেই বায়ুমন্ডলে রয়েছে নাইট্রোজেন গ্যাস, অল্প পরিমানে মিথেন। বর্ণালী বিশ্লেষণ করে সেখানে বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন, নাইট্রাইল এবং কার্বন ডাই অক্সাইড মিশ্রিত যৌগ এবং জলীয় বরফের সন্ধানও মিলেছে। এই সব জটিল যৌগ প্রাণের সৃষ্টি আর বিকাশের জন্যে খুবই জরুরি। সেই কারণেই শনির এই উপগ্রহটি বিজ্ঞানীদের মনে কৌতুহল জাগিয়েছে। এখানের তাপমাত্রা আর বায়ুর চাপ এমন যে এখানে ইথেন (C_2H_6) (মিথেন গ্যাস থেকে যা সবথেকে বেশী পরিমানে তৈরী হতে পারে), তরল অবস্থায় থাকতে পারে। সেই কারণে বিজ্ঞানীরা আমাদের পৃথিবীর বুকের জলের সমুদ্রের মতো টাইটানের বুকে ইথেনের জলীয় সমুদ্র থাকার সম্ভবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন না। পৃথিবী থেকে পাঠানো ক্যাসিনি মহাকাশযান (Cassini space craft) টাইটানের ঐ রকম একটি সমুদ্রের ধারে গিয়ে নামবে এবং অন্যান্য অনেক পরীক্ষার সঙ্গে টাইটানে প্রাণেরও অনুসন্ধান করবে। মঙ্গলগ্রহের মতো টাইটান হয়তো আমাদের হতাশ নাও করতে পারে। (চলবে)

প্রাচীন ভারতবর্ষে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা (১)

পার্থ সারথি পাল

সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স, কলকাতা

ভারতবর্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকেই জ্যোর্তিবিজ্ঞান চর্চা হয়ে আসছে। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থের উদ্ধৃতি থেকে আমরা জানতে পারি যে সেই বৈদিক যুগ (আনুমানিক 3000 BC) থেকেই এখানে জ্যোতিষ চর্চার থেকে সম্পুর্ণ পৃথক ভাবে মহাকাশের বিভিন্ন ঘটনাকে পর্যবেক্ষন করে ও অঙ্ক কষে অনুধাবন করার মাধ্যমে বহু মহাজাগতিক ঘটনার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন। তাদের আবিষ্কারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল - গ্রহণের পুর্বাভাস, পৃথিবীর পরিধি নির্ণয়, মহাকর্ষ সমন্ধে জ্ঞানলাভ, সৌরজগৎ সমন্ধে ধারণা ও প্রভৃতি। প্রাচীন ভারতের জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা পাই (Pi) ও অন্যান্য গাণিতিক ধ্রুবকের মান সঠিক ভাবে নির্ণয় করেছিলেন।

বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে নানা সময় বিভিন্ন মহাবৈশ্বিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারতের বিভিন্ন অংশে কিছু মহাজাগতিক ঘটনাবলীর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন:

- কার্তিক বা কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জে সূর্যগ্রহন
- বুধের পশ্চাদগমন (retrogation)
- শুক্রের পশ্চাদগমন (retrogation)
- মাঘ নক্ষত্রপুঞ্জে মঙ্গলের পশ্চাদগমন কালে বৃহস্পতির রোহিনী নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থান।
- শনির রোহিনী নক্ষত্রপুঞ্জে অবস্থান
- পৌষ নক্ষত্রপুঞ্জে হ্যালির ধুমকেতুর উপস্থিতি
- কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগের রাত্রে উল্কাপাত
- মাঘ শুক্লাষ্টমীতে ভীষ্মের দেহত্যাগের সময় চন্দ্রের রোহিনীতে সূর্যের মকরক্রান্তিতে অবস্থান।

বৈদিক যুগে বিভিন্ন নক্ষত্রের গতিবিধির উপর ভিত্তি করে ক্যালেন্ডার আবিষ্কৃত হয়েছিল। ঋকবেদে ২৭টি নক্ষত্রমন্ডলের উল্লেখ আছে ও তাদের সাথে সূর্যের গতিবেগের সাথে সম্পর্কের উল্লেখ আছে। তখনকার দিনে কালপুরুষ নক্ষত্রমন্ডলের মহাবিষুবের (Vernal equinox of Orion) সাহায্যে বছরের শুরুকে চিহ্নিত করা হত। প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (9th - 8th century BC)[2.7] ও বিষ্ণু পুরাণে (1st Century)[2.8] উল্লিখিত আছে যে : ''সূর্য উদিত হয় না অস্তও যায় না। যখন মানুষ দেখে সূর্য অস্ত যাচ্ছে তখন তারা এর ভুল ব্যাখ্যা করে।'' এর থেকেই বোঝা যায় যে অত প্রাচীনকালেও পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে আবর্তন সম্পর্কে সঠিক ধারণা ছিল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে যাজ্ঞবল্ক মুনি মনে করতেন যে পৃথিবী গোলাকার। তিনি তার লেখা শতপথ ব্রাহ্মণে (8.7.3.10) বলেছেন যে ''সূর্য এই ব্রহ্মান্ডকে - পৃথিবী, বায়ুমন্ডল ও গ্রহমন্ডলকে সুতোয় বেধে ঘোরাচ্ছে।''। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সূর্য পৃথিবীর চেয়ে আকারে বড়। অনুমান করা হয় যে এই ধারনা থেকেই সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতের কথা তখন সকলের মাথায় এসেছিল। তিনি অঙ্ক কষে অনুমান করে ছিলেন যে পৃথিবী থেকে সূর্যের দুরত্ব পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দুরত্ব অপেক্ষা 108 গুন। 95 বছর অন্তর

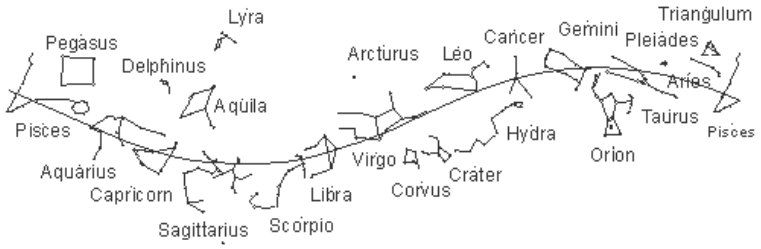

চন্দ্রের গতিপথে নক্ষত্রপুঞ্জের অবস্থান (ইংরাজী)

সূর্য ও চন্দ্র সমলয় বিশিষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়, এর থেকেই তিনি ক্রান্তীয় বৎসরের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেছিলেন যার মান 365.24675 দিন। বর্তমানে ক্রান্তীয় বৎসরের (Tropical year) দৈর্ঘ্য হল 365.24220 দিন যার পার্থক্য মাত্র 6.6837 মিনিট। তার দ্বারা প্রাপ্ত মান আগামী 1000 বছর পর্যন্ত সর্বাপেক্ষা সঠিক ছিল। সেই যুগে এও অনুমান করা হয়েছিল যে আকাশে সুর্য ছাড়াও আরো অনেক নক্ষত্র আছে।

প্রাচীন ভারতের জ্যোর্তিবিজ্ঞান চর্চার প্রমাণস্বরূপ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থটি হল সূর্যসিদ্ধান্ত। কিন্তু বহুপ্রাচীন হবার জন্য এর সব অংশ আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে যেটুকু পাওয়া গেছে তাহাই প্রাচীন ভারতের মহিমা প্রচারের পক্ষে যথেষ্ট। এতে সাধারণত সূর্য, চন্দ্রগ্রহণ ও দিন গণনার পদ্ধতি উল্লেখ করা আছে।

হিন্দু দিনগণনার পদ্ধতির সাথে বর্তমানের জুলিয়ান দিনগণনার পদ্ধতির বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মূল জটিলতার বিষয়টি হল হিন্দু ক্যালেন্ডারটি চাঁদের আর্বতনের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছে। সূর্যসিদ্ধান্তে কোনো জ্যোর্তিবৈজ্ঞানিক বস্তুকে আকাশে চিহ্নিত করার জন্য বর্তমানের বিষুববৃত্ত (Celestial Sphere) এর সাহায্যে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং সূর্যের গতিপথকে ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic) হিসাবে অবহিত করা হয়েছে। এবং চন্দ্রের গতিপথ যখন সূর্যের ক্রান্তিবৃত্তকে ছেদ করে তখনই গ্রহণ হয়। এসকল তথ্য সূর্যসিদ্ধান্তেই উল্লেখ করা হয়েছিল ও ওইখান থেকেই প্রাপ্ত। নীচের চিত্রে দেখানো হল চন্দ্র কোন সময় কোন নক্ষত্রমন্ডলের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে ও তার সাথে সামন্জস্য রেখে তাদের নামকরন করা হয়। পাঠকদের সুবিধার জন্য নক্ষত্রমন্ডলের হিন্দু নামগুলি দেওয়া হল। যেমন:- চন্দ্র চৈত্র মাসে চিত্রা নক্ষত্রমন্ডলে বা virgo constellation এ, শ্রাবন মাসে aquila constellation এ প্রভৃতি। এছাড়াও এতে বিভিন্ন ভাবে দিন ও বৎসরের গণনার নীতিও বলা হয়েছে।

চন্দ্রের গতিপথের ত্রিমাত্রিক চিত্র

ভারতীয় জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা সেই গুপ্তযুগেই (300 AD) উপলব্ধি করেন যে সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ কেবলমাত্র আলো-ছায়ার কারসাজি। গ্রহণের সময় চাঁদ ও সূর্য তাদের কক্ষপথের নিকটতম দূরত্বে থাকে। চাঁদ পৃথিবীকে 27 দিনে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর সাপেক্ষে সূর্য যে কক্ষপথ বরাবর প্রদক্ষিণ করছে তাকে ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic) বলা হয়। চন্দ্র যে যে সময় ক্রান্তিবৃত্তকে অতিক্রম করে তখন গ্রহণ হয়। ঐ দুটি বিন্দুকে নোড বলা হয়। যখন চাঁদ উত্তরদিকে যাবার সময় ঐ বিন্দুকে অতিক্রম করে তাকে Ascending Node বলে ও দক্ষিণমুখে অতিক্রম করে তখন করে তখন তাকে Descending Node বলে। যদি চন্দ্র ও সূর্য একই নোডের কাছাকাছি থাকে তখন সূর্যগ্রহণ হয় ও যদি চন্দ্র ও সূর্য বিপরীত নোডের কাছাকাছি থাকে তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। পুরাণের গল্প অনুযায়ী Ascending Node -কে রাহু ও Descending Node -কে কেতু বলেছেন। প্রাচীন ভারতে যে হিন্দু ক্যালেন্ডারের উল্লেখ পাওয়া যায় - তা চন্দ্রের উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছিল। এক চান্দ্রদিনকে এক তিথি বলা হয়। 30 টি তিথি 29.5 সৌরদিনের সঙ্গে সমান। চন্দ্র যখন যে নক্ষত্রপুন্জে অবস্থান করত তার নাম অনুসারে সেই মাসের নাম করা হয়েছে। যেমন - চৈত্র (চিত্রা নক্ষত্রপুঞ্জ), কার্তিক (কৃত্তিকা নক্ষত্রপুঞ্জ) ইত্যাদি। পরে গ্রীস থেকে সৌরদিবসের উপর ভিত্তি করে ক্যালেন্ডার আমদানী হয়। সপ্তাহে 7 দিনের ধারণা গ্রীস থেকেই এসেছিল।

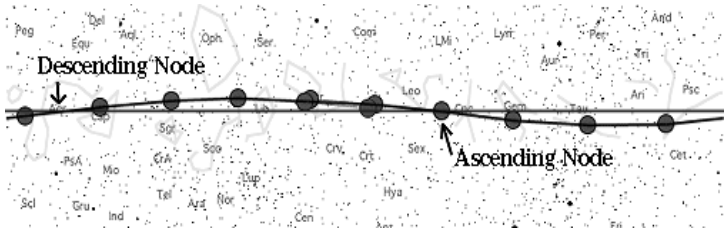

চন্দ্রের গতিপথে নোডের অবস্থান

(চলবে)

ডার্ক ম্যাটার ও মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ

কাকলি সরকার, নদীয়া

মহাকাশে এমন কিছু অদৃশ্য বস্তু আছে যা মানুষ শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে ও দেখতে অক্ষম।রহস্যাবৃত সেই অদৃশ্য বস্তুই হল অদীপ্ত পদার্থ বা Dark Matter।

1933 সাল। ফ্রিৎজ জুইকি (Fritz Zwicky) ও তাঁর সহকর্মীরা গবেষণায় রত। বিষয় তারাজগৎ বা গ্যালাক্সির গতিবেগ। গ্যালাক্সির উজ্জ্বল্যকে মাপকাঠি করে আগেই তিনি এদের ভর নির্ণয় করেন। এইবার তিনি ভর নির্ণয় করলেন অন্য পদ্ধতি ব্যবহার করে। আশ্চর্যে হতবাক তিনি। ভরের অঙ্কটা এবার তিনি 400 গুন বেশী পেলেন। অথচ গ্যালাক্সির যেসব বস্তু আলো তাপ বিকিরণ করছে তাদের সমষ্টিগত ভর তো এত বেশী হওয়া সম্ভব নয়। দৃশ্যমান ভরের চেয়েও অতিরিক্ত ভরের অস্তিত্ব বিজ্ঞানীদের প্রচন্ড জোরে নাড়া দিল। তখনই গ্যালাক্সির ভিতর অদৃশ্য বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলে বিজ্ঞানীরা সন্দেহ প্রকাশ করলেন। 1970 সাল পর্যন্ত জুইকি এর কোনো উত্তর পেলেন না।

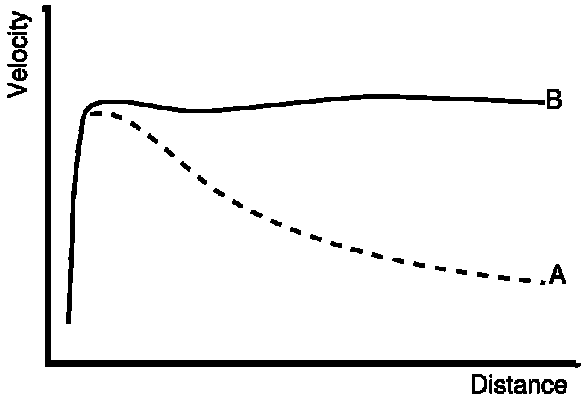

পরবর্তীকালে গ্যালাক্সির গতিবেগ নির্ণয় করতে গিয়ে অদ্ভুত ফলাফল পেলেন। দেখা গেল গ্যালাক্সিগুলো প্রচন্ড গতিবেগে ঘুরছে। গতিবেগ এতই বেশী যে গ্যালাক্সি থেকে বস্তু ছিটকে বেরিয়ে চলে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু তা তো হচ্ছেনা। এমন কোনো পদার্থ আছে যা একাজে বাধা দিচ্ছে। সেই পদার্থের মহাকর্ষ বল গ্যালাক্সির ভিতরের দিকে পদার্থকে আটকে রেখেছে। এছাড়াও গ্যালাক্সির ভিতরের নক্ষত্রদের গতিবেগেও রয়েছে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। পরিধির দিকের নক্ষত্রদের গতিবেগ কম হওয়া উচিৎ। অথচ ঠিক তার উল্টো ঘটনা ঘটে। বিজ্ঞানীরা বেশ কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন যে মহাবিশ্বের এক বিশাল পদার্থ তাদের কাছে অজানা ও অদৃশ্য রয়েছে। এদের নাম হল ডার্ক ম্যাটার।

ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্বের সপক্ষে আরো একটি প্রমাণ আছে তা হল বড় কোনো গ্যালাক্সির চারপাশে ছোট গ্যালাক্সির প্রদক্ষিণ। এ. ইয়াহিল, জে অসট্রাইটার একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেন। বড় গ্যালাক্সির চারদিকে ছোট গ্যালাক্সির ঘূর্ণনের গতি উভয়ের মধ্যে যে কোনো দূরত্বেই সমান। অথচ দূরত্ব পরিবর্তনের সাথে সাথে গতিবেগের ও পরিবর্তন হওয়া উচিৎ। তখন বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখলেন যে ছোট বড় উভয় গ্যালাক্সিরই দৃশ্যমান অংশের যে ভর সেই ভরই যদি গ্যালাক্সিদ্বয়ের প্রকৃত ভর হত তাহলেই তারা কেপলারের সূত্র মেনে চলত। কিন্তু তাদের ভিতরের বেশীরভাগ পদার্থই তো অদৃশ্য হয়ে রয়েছে। তাদের প্রকৃতিও অজানা। তাই কেন্দ্রীয় গ্যালাক্সির চারদিকে ছোট গ্যালাক্সির গতিবেগ কেপলারের সূত্র মেনে চলছে না। তাছাড়া গ্যালাক্সিদ্বয়ের মধ্যে ক্রিয়াশীল মহাকর্ষ বলেও অসামঞ্জস্য দেখা গেছে। অদৃশ্য কোনো বস্তুর প্রভাব ছাড়া এইসব বৈচিত্র্য দেখা যেতে পারে না। এইভাবে বিজ্ঞানীরা ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছেন।

পদার্থবিদরা অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন মহাবিশ্বের মোট ভরের 90% - 99% ভরের হিসাব মিলছে না। টেলিস্কোপে মহাবিশ্বের যে সব বস্তুর চিত্র ধরা পড়েছে তাদের সম্মিলিত ভর মহেবিশ্বের মোট ভরের খুবই সামান্য অংশ। 90% - 99% ভরই রয়েছে ডার্ক ম্যাটার রূপে। কিন্তু এই ডার্ক ম্যাটার কি দিয়ে তৈরী সেই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত নন। কি ধরণের পদার্থ দিয়ে এই ডার্ক ম্যাটার তৈরী যা মহাবিশ্বের বিশাল ভরের হিসাব দিতে পারে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের জল্পনা কলপনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ নেই। জ্যোর্তিবিজ্ঞানীরা বলেন ডার্ক ম্যাটার MACHOS (Massive Astronomical Compact Halo Object) দিয়ে তৈরী। আবার কণা পদার্থবিদরা মনে করেন ডার্ক ম্যাটারের উপাদান হল WIMPs (Weak Interacting Massive Particles) কেউ কেউ মনে করেন

MACHOS, WIMPs উভয় দিয়েই ডার্ক ম্যাটার গঠিত। এই MACHOS ও WIMPs কি তা একটু জেনে নেওয়া যাক।

MACHOS সাধারন ও পরিচিত পদার্থ দিয়ে তৈরী মহাজাগতিক অদৃশ্য বস্তু। বাদামী বামন (Brown Dwarf) ও কৃষ্ণগহ্বর (Black Hole) এর সদস্য। বাদামী বামন হল গ্যাসীয় পদার্থের সমষ্টি। এরা কোনো নক্ষত্র নয় কিন্তু নক্ষত্র সৃষ্টির পরিবেশ থেকেই এদের জন্ম। কৃষ্ণগহ্বর হল নক্ষত্রের জীবনের একটি দশা। এদের এক একটির ভর কয়েকশো থেকে কয়েক কোটি সূর্যের ভরের সমান। জ্যোর্তিবিজ্ঞানীদের ধারনা বাদামী বামন ও কৃষ্ণগহ্বরই মহাবিশ্বের 90% - 99% ভরের সন্ধান দিতে পারে। অপর দিকে হল অত্যন্ত ক্ষুদ্র কণা। এদের ভর ইলেকট্রনের ভরের তুলনায় প্রচুর কম। সামান্য ভর হওয়ায় এদের গতিবেগ আলোর গতিবেগের কাছাকাছি। নিউট্রন, নিউট্রিনো, টাউঅন, পজিট্রন ইত্যাদি হল WIMPs এর সদস্য। কণা-পদার্থবিদরা জানাচ্ছেন মহাবিশ্বে প্রতি সেকেন্ডে কোটি কোটি WIMPs তৈরী হচ্ছে। এদের আয়ুষ্কাল এক মুহুর্তেরও কোটি কোটি ভাগ কম। প্রতি সেকেন্ডে ঝাঁকে ঝাঁকে WIMPs বিশেষ করে নিউট্রিনো আমাদের ভেদ করে চলে যাচ্ছে। WIMPs এর অস্তিত্ব শুধু তাত্ত্বিক জগতে। বাস্তবে এরা কোন যন্ত্রে ধরা পড়েনি বললেই চলে।

MACHOS না WIMPs ডার্ক ম্যাটারের উপাদান তা নিয়ে বিতর্কের অবসান নেই। তবে একটা বিষয়ে সব বিজ্ঞানীরা একমত। সেটা হল মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ডার্ক ম্যাটারের উপর। মহাবিশ্বের ক্রান্তিক ঘনত্ব (Critical Density) 1। 90% - 99% ভরের সন্ধান যদি পাওয়া যায় তবে ক্রান্তিক ঘনত্বে পৌছবে। ডার্ক ম্যাটারের ভর যদি ঐ 90% - 99% ভরের চেয়ে কম হয় তবে ক্রান্তিক ঘনত্ব 1 এর কম হবে। আর যদি বেশী হয় তবে ক্রান্তিক ঘনত্বও বেশী হবে। মহাবিশ্বের পরিণতি তিন রকম হতে পারে। বদ্ধ (Close), মুক্ত (Open), সমতল (Flat)। ক্রান্তিক ঘনত্ব 1 এর কম হলে মহাবিশ্ব হবে মুক্ত অর্থাৎ মহাবিশ্ব চিরকাল প্রসারিত হতে থাকবে। মহাজাগতিক বস্তু ও কণাদের মহাকর্ষ বল এই প্রসারন বন্ধ করতে পারবে না। ক্রান্তিক ঘনত্ব 1 এর বেশী মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে শুরু করবে। আজকের সমস্ত মহাজাগতিক বস্তু ও কণাদের মহাকর্ষ বল তাদেরকে একটা বিন্দুতে এনে মিলিত করবে। এই মহাবিশ্ব হল বদ্ধ। যদি ক্রান্তিক ঘনত্ব 1 হয় তাহলে মহাবিশ্ব সমতলে পরিণত হবে। অর্থাৎ মহাকর্ষ বল মহাবিশ্বের প্রসারনকে বন্ধ করতে পারলেও সংকোচন ঘটাতে পারবে না। মহাবিশ্ব স্থিতাবস্থা লাভ করবে। এইসব কারনে ডার্ক ম্যাটার বর্তমানে বিজ্ঞানীদের কাছে ভাবনার প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর উপর আলোকপাত করলেই মহাবিশ্বের ভবিষ্যৎকে দেখা যাবে।

শনি অভিযান -১

কিংশুক আচার্য্য

সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স, কলকাতা

সৌরজগতের সবথেকে চিত্তাকর্ষক গ্রহ শনি। সেই টেলিস্কোপ আবিষ্কারের যুগ থেকে মানুষের মনে শনি সম্পর্কে আনন্ত জিজ্ঞাসা। শনি দুরত্বের বিচারে সূর্য থেকে ষষ্ঠ গ্রহ এবং সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ, যার নিরক্ষীয় ব্যাস 119300 কি মি .(741300 মাইল)। শনি তার মেরু অঞ্চলে কিছুটা চ্যাপ্টা, কারণ শনি তার অক্ষের চারদিকে খুব দ্রুতগতিতে আবর্তন করে। শনির একদিন হল ১০ ঘন্টা ৩৯ মিনিট (পৃথিবীর সাপেক্ষে) এবং সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে শনির সময় লাগে ২৯.৫ বছর। শনি, শনির বলয় ও তার উপগ্রহ সম্পর্কে জানার জন্য বেশ কয়েকটি মহাকাশ অভিযান হয়েছে, এই লেখাতে আমি এই বিষয়ে আলোকপাত করবো।

শনির উদ্দ্যেশে পাঠানো প্রথম মহাকাশযানটির নাম পাইওনিয়ার-11 (Pioneer-11)। এই মহাকাশযানটি, April 6, 1973 সালে পৃথিবী থেকে উৎক্ষেপন করা হয়েছিলো এবং মহাকাশযানটি শনির কক্ষপথে প্রবেশ করে September 1, 1979। এই মহাকাশযানটির পাঠানো চিত্র থেকে শনির কিছু নতূন বলয় ও উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। এই মহাকাশযানটির পাঠানো তথ্য থেকেই প্রথম জানা যায় যে শনির উপগ্রহ টাইটান খুব ঠান্ডা তাই এখানে প্রাণ থাকা সম্ভব নয়।

এরপর পাঠান হয় যথাক্রমে ভয়েজার-১ ও ভয়েজার-২ নামে দুটি মহাকাশযান। এই মহাকাশযান দুটি পৃথিবী থেকে উৎক্ষেপন করা হয় যথাক্রমে September 5, 1977 ও August 20, 1977 সালে এরা শনির কক্ষপথে প্রবেশ করে যথাক্রমে November 9, 1980 ও Auguest 26, 1981 তারিখে। এই দুটি মহাকাশযান শনি, শনির বলয় ও তার উপগ্রহদের প্রচুর ছবি পাঠায় যার থেকে শনি সম্পর্কে বেশ কিছু নতূন তথ্য জানা যায়। এবার আমি সংক্ষেপে সেই বিষয়ে বলে নিই।

শনির আবহমন্ডলে মূলত হাইড্রোজেন ও অল্পমাত্রায় মিথেন ও হিলিয়াম গ্যাস দিয়ে তৈরী। শনি হল একমাত্র গ্রহ যার ঘনত্ব জলের থেকেও কম (প্রায় 30 % কম)। বৃহস্পতির ন্যায় শনির ধূসর হলুদ বলয়কে বায়ুস্তর হিসাবে অনুমান করা যায়। কিন্তু শনির বলয় তুলনামূলক ভাবে বৃহস্পতির বলয় অপেক্ষা হালকা। শনির বায়ুমন্ডলে বায়ুর গতিবেগ অনেক বেশী। নিরক্ষীয় অঞ্চলে তা বেড়ে দাঁড়ায় 500 মি./সে. (1,100 মাইল প্রতি ঘন্টা)। শনিতে সাধারনত পূর্বাভিমুখে বায়ু প্রবাহিত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে বায়ুর গতিবেগ সবচেয়ে বেশী এবং অক্ষাংশ বৃদ্ধির সাথে সাথে বায়ুর গতিবেগ সমহারে কমতে থাকে। 35 ডিগ্রী অক্ষাংশের উপরে বায়ুপ্রবাহের অভিমুখ পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিবর্তিত হতে থাকে।

সুন্দর বলয়মন্ডল থাকার জন্য শনি সৌরজগতের অন্যতম সুন্দর গ্রহ। শনির বলয়মন্ডলকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায় - যার মধ্যে উজ্জ্বল A ও B বলয় এবং হালকা C বলয় অন্যতম। বলয়গুলির মধ্যে অনেক ফাঁকা জায়গা আছে। A ও B বলয়ের মাঝে ক্যাসিনি (Cassini) ব্যবধানকে সবথেকে ভালোভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়। 1675 সালে জিওভানি ক্যাসিনি এই ব্যবধানটিকে আবিষ্কার করেন। A রিংটিকে Encke ব্যবধান দুই ভাগে বিভক্ত করে। 1837 সালে Johann Encke সর্বপ্রথম এটিকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। দেখা গেছে এই বলয়গুলি অনেক সরু সরু উপবলয়ের সমষ্টি। এগুলির উৎস এখনো অজানা থেকে গেছে। মনে করা হয় যে এই বলয়গুলি বড় বড় উপগ্রহের সঙ্গে উল্কা ও ধূমকেতুর সংঘর্ষের ফলে তৈরী হয়েছে। এই বলয়গুলির উপাদান এখনো স্পষ্ট নয় তবে এই বলয়গুলিতে জলের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এগুলি বরফের টুকরো দিয়ে তৈরী যার আকৃতি কয়েক সেন্টিমিটার থেকে কয়েক মিটার পর্যন্ত হতে পারে। নিকটবর্তী উপগ্রহের মহাকর্ষের প্রভাবে কিছু বলয়ের আকার বিকৃতি ঘটেছে যেমন F বলয়ের বিকৃতি। এ ছাড়াও 17 টি নতূন উপগ্রহ আবিষ্কার হয়েছে।

এরপর শনির উদ্দ্যেশে যাত্রা করে ক্যাসিনি-হাইগেন্স মহাকাশসযানটি। এই মহাকাশযানটি দুটি মূল অংশে বিভক্ত, একটির নাম ক্যাসিনি অরবাইটার (Cassini Orbiter), বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জিওভানি ক্যাসিনির নামানুসারে এবং অপরটির নাম হাইগেন্স প্রোব, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ক্রিশ্চয়ান হাইগেন্সের নামানুসারে। মহাকাশযানটি কে 1997, 15 অক্টোবর মাসে

পৃথিবী থেকে উৎক্ষেপন করা হয়। প্রায় সাত বছর পর 2004, পয়লা জুলাই শনির কক্ষপথে প্রবেশ করে। 2005, 14ই জানুয়ারি হাইগেন্স প্রোব টাইটানে অবতরন করে।

প্রথমে ক্যাসিনি-হাইগেন্স মহাকাশজানটির বৈজ্ঞানিক লক্ষ্যগুলি বলে নেওয়া যাক।

- শনির বলয়ের ত্রিমাত্রিক গঠন তাদের তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। এ ছাড়াও এদের প্রচুর ছবি তুলে পৃথিবীতে পাঠাবে।
- শনির Magnetosphere র ত্রিমাত্রিক গঠন তাদের তাদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানার জন্য
- শনি ও তার বিভিন্ন উপগ্রহের ভূভাগ ও ভূতত্ত্বীয় ইতিহাস জানার জন্য
- শনির একটি উপগ্রহ আছে যার নাম আইপেটাস (Iapetus), এর ভূভাগ খুবই বৈশিষ্ট্যময়।
- এর অর্দ্ধেক অংশ খুব অন্ধকারময় ও অন্য অর্দ্ধেকটা খুব উজ্জ্বল। এই মহাকাশযানটি এ ব্যাপারেও গবেষণা করবে।
- শনির বায়ুমন্ডল, টাইটানের মেঘ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে জানার জন্য।

এই মহাকাশযানে 27 টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য Cassini Orbiter-এ 12 টি ও হাইগেন্স প্রোব এ 6 টি যন্ত্র পাঠানো হয়েছে। প্রত্যেকের আগ্রহ থাকে মহাকাশে ঠিক কি ধরনের যন্ত্রপাতি পাঠানো হয় এবং এই যন্ত্রপাতিগুলি ঠিক কি কাজে ব্যবহার হয়। এই সংখ্যাতে আমি ক্যাসিনির প্রধান যন্ত্রপাতি গুলো এবং এর কাজ খুব সংক্ষেপে বলব।

প্রথমে Cassini Orbiter-এ যে 12 টি যন্ত্র পাঠানো হয়েছে সে ব্যাপারে বলে নেব।

- Imaging Science subsystem (ISS): এর সাহায্যে দৃশ্যমান আলোক, অতিবেগুনি ও অবলোহিত আলোকে শনির ছবি তোলা সম্ভব হবে।

- Radio Detection and Ranging Instrument (RADAR): এই যন্ত্রটির মূলত ভুমির মানচিত্র অঙ্কন করতে সক্ষম। এছাড়াও পাহাড়ের উচ্চতা, গিরিখাতের গভীরতা ইত্যাদি পরিমাপ করে সেই তথ্য পৃথিবীতে পাঠাবে। এথাড়াও শনি বা তার কোনো উপগ্রহ যদি কোনো বেতার তরঙ্গ উৎপন্ন করে তা পরিমাপ করবে।

- Radio Science Subsystem (RSS): এই যন্ত্রটির সাহায্যে পৃথিবীর অ্যান্টেনা ব্যবহার করে মহাকাশযান থেকে পাঠানো বেতার তরঙ্গ, টাইটানের বায়ুমন্ডলে ও শনির বলয়ে কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তা জানা যায়। এছাড়াও বায়ুমন্ডল ও আয়নমন্ডলের গঠন, বলয়ের বিভিন্ন বস্তুর আকার, ইত্যাদি পরিমাপ করা যায়।

- Visible and Infrared Mapping Spectrometer: এই যন্ত্রটি মূলত দূটি ক্যামেরা দিয়ে তৈরি। একটি দৃশ্যমান আলোকের ছবি তোলার জন্য ও অন্যটি অবলোহিত রশ্মিতে ছবি তুলতে সক্ষম। এটি ও শনির বলয়, বিভিন্ন উপগ্রহের ছবি তুলতে সক্ষম। এ ছাড়া ও যখন কোনো আলোক বলয়ের মধ্য দিয়ে যায় তখন তার ছবি তুলে রাখবে যার সাহায্যে শনির বলয়ের গঠন সম্পর্কে বিশদে জানা যায়।

- Ion and Neutral Mass Spectrometer (INMS): এই যন্ত্রটি বিভিন্ন ধরনের আধান যুক্ত ও আধান-বিহীন কণিকা কে বিশ্লষন করতে পারে। এই যন্ত্রটি ও মূলত শনি ও টাইটানের বায়ুমন্ডল সম্পর্কে জানার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।

Composite Infrared Spectrometer (CIRS): এই যন্ত্রটি কোনো বস্তু থেকে আসা অবলহিত রশ্মি মাপতে পারে যার সাহায্যে ওই বস্তুটির তাপমাত্রা ও বস্তুটির গঠন সম্পর্কে জানা যায়। CIRS, শনির বায়ুমন্ডল, বলয় ও শনির ভূভাগ থেকে আসা অবলোহিত বিচ্ছুরন পরিমাপ করে এদের তাপমাত্রা, গঠন ও তাপীয় অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করবে। এ ছাড়াও এই যন্ত্রটি শনির বায়ুমন্ডলের ত্রিমাত্রিক মানচিত্র তৈরি করবে যার সাহায্যে উচ্চতার সাথে তাপমাত্রা, বায়ুরচাপ, ঘনত্ব ইত্যাদির পরিবর্তন জানা সম্ভব হবে।

Cosmic Dust Analyzer (CDA): CDA-র সাহায্যে শনির আশেপাশের মহাজাগতিক ধুলিকণার আকার, গতিবেগ, তাদের দিক নির্ণয় করতে পারে। এই ধুলিকণার একটা অংশ শনি থেকে আসে ও আর একটা অংশ অন্য গ্রহ থেকে

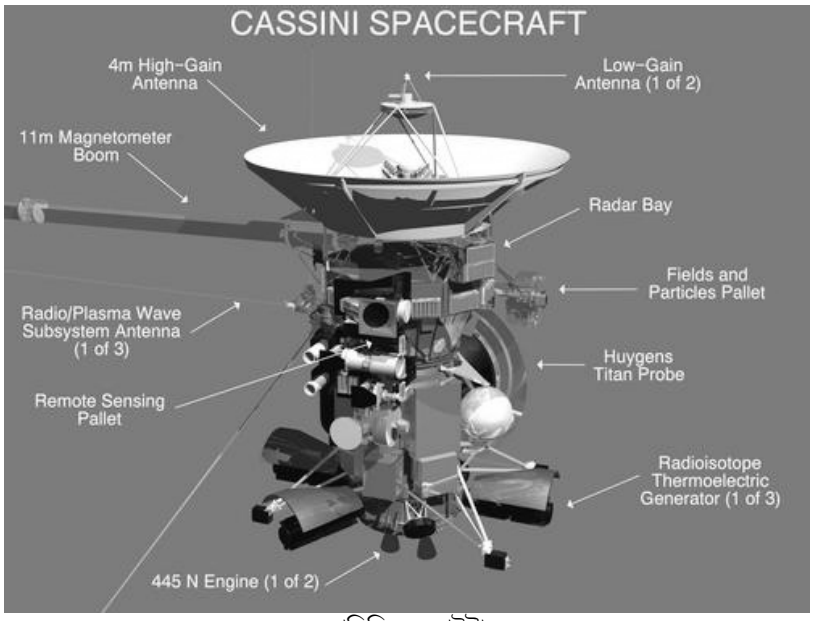

ক্যাসিনি অরবাইটার

আশে। এই রহস্যময় কনিকা সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের জন্য এই যন্ত্রটি খুব কাজে লাগবে।

(b) Cassini Plasma Spectrometer (CAPS): এই যন্ত্রটির মাধ্যমে শনির আয়নমন্ডল থেকে সৃষ্ট অণুগুলির শক্তি ও আধান মাপা যাবে এবং শনির চুম্বকক্ষেত্র সম্পর্কে জানা যাবে। এ ছাড়াও এখানকার প্লাজমা ও শনির Magnetosphere-র মধ্যেকার সৌর বায়ুর সম্পর্কে জানা যাবে।

- Radio Plasma Wave Science Instrument (RPWS): এই যন্ত্রটি ও মূলত শনি থেকে আসা বেতার তরঙ্গ পরিমাপ করে। ইহার সাহায্যে গ্রহ মধ্যবর্তী তড়িৎ চুম্বকক্ষেত্র পরিমাপ করতে সক্ষম। এ ছাড়াও এই যন্ত্রটি বহুবিধ জটিল কার্যকলাপ করে যার বিশদ বিবরন এখানে দেওয়া সম্ভব নয়।

- Cassini Plasma Spectrometer: শনির চুম্বকক্ষেত্রের মধ্যে ও কাছাকাছি অঞ্চলে প্লাজমার (তড়িতাহীত কনা) সন্ধান করে।

- Ultraviolet Imaging Spectrograph (UVIS): এই যন্ত্রটি কোনো বস্তু থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মি সাহায্যে ওই বস্তুর ছবি তুলতে সক্ষম। এর সাহায্যে ও শনি ও তার বলয়ের বিভিন্ন তথ্য জানা যায়।

- Magnetospheric Imaging Instrument (MIMI): এই যন্ত্রটির সাহায্যে শনির Magnetospheric-র ছবি তোলা যায়, এ ছাড়াও শনির চুম্বকক্ষেত্রে যে সমস্ত কণিকা প্রবেশ করে তাদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম।
- Dual Technique Magnetometer (MAG): এর সাহায্যে শনির চুম্বকক্ষেত্র সম্পর্কে বিশদে জানা যাবে। শনির চুম্বকক্ষেত্র এর কেন্দ্রকের গলিত লাভা থেকে সৃষ্টি হয়। তাই শনির কেন্দ্রক সম্পর্কে জানার জন্য এর চুম্বকক্ষেত্র মাপা খুব জরুরি।

এবারে আশা যাক হাইগেন্স প্রোবে যে ছয়টি যন্ত্র পাঠানো হয়েছে তাদের ব্যাপারে।

- Descent imager and spectral radiometer (DISR): এর সাহায্যে টাইটানের ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমন্ডলের ছবি তোলা যায় ও তাপমাত্রা মাপা যায়।

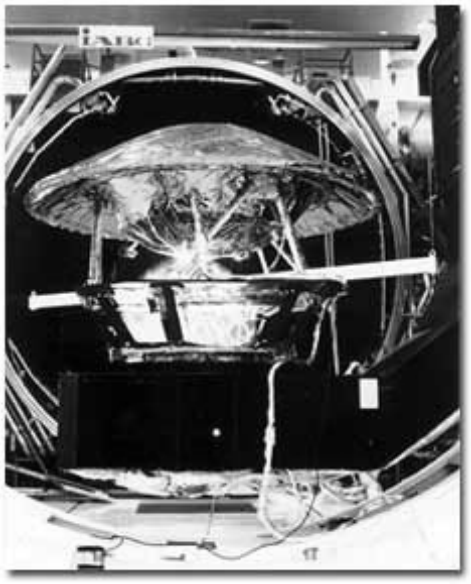

হাইগেন্স প্রোবে

- Huygens atmospheric structure instrument (HASI): এর সাহায্যে টাইটানের বায়ুমন্ডলের গঠন সম্পর্কে জানা যায়।
- Gas chromatograph and mass spectrometer (GCMS): এর সাহায্যে টাইটানের বায়ুমন্ডলের গ্যাস ও ভাসমান ধুলিকণার রাসায়নিক গঠন সম্পর্কে জানা যায়।
- Aerosol collector pyrolyzer (ACP): টাইটানের বায়ুমন্ডলের মেঘ ও ভাসমান ধুলিকণা পরীক্ষা করে ও বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে।
- Surface science package (SSP): টাইটানে ভূপৃষ্ঠ পরীক্ষা করে ও এর গঠন ও ভৌত ধর্ম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে।
- Doppler wind experiment (DWE): হাইগেন্স প্রোব যখন টাইটানে অবতরন করে তখন এর উপর টাইটানের বায়ুমন্ডলের কি প্রভাব ছিল সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে।

এই হল Cassini Orbiter ও হাইগেন্স প্রোব এ পাঠানো যন্ত্র গুলোর খুব সংক্ষেপ বিবরন। এর পরের সংখ্যাতে এর থেকে যে সমস্ত চমকপ্রদ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত হয়েছে সে সম্বন্ধে বলা হবে। (চলবে)

হাবলের ধ্রুবক

অধ্যাপক সন্দীপ চক্রবর্ত্তী

সত্যেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় মৌল বিজ্ঞান কেন্দ্র
ও
সেন্টার ফর স্পেস ফিজিক্স,কলকাতা

আজ থেকে প্রায় 30 বছর আগে যখন আমি নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে যখন স্নাতক স্তরে ভর্তি হই তখনই আমার প্রশ্ন জাগে যে যদি আমাদের সৌরজগৎ বিবর্ধমান হত তবে একদিন মঙ্গল নিশ্চয়ই সূর্য থেকে এমন দূরত্বে ছিল যেখানে আজ পৃথিবী অবস্থান করছে। যদি তাই হয় তবে তখন মঙ্গলে প্রাণ সঞ্চার হওয়াও সম্ভব ছিল। যদি তাই হয় তবে তখনকার বিখ্যাত কল্পবিজ্ঞানের লেখক এরিক ভন দানিকেন যে বলেছিলেন পৃথিবীতে ভিনগ্রহের প্রাণীরা এসেছিল তা হয়ত সত্য। যেহেতু মঙ্গল তখন সূর্য থেকে সরে যাচ্ছিল তাই তাঁরা হয়ত পৃথিবীতে সভ্যতা স্থাপন করতে চেয়েছিল। এই ভেবে আমি খুব গুরুত্ব দিয়ে হিসাব করতে শুরু করি। এটা করতে গিয়ে সবার আগে আমার যে ধ্রুবকটির প্রয়োজন হয়েছিল সেটি হল হাবলের ধ্রুবক। এই ধ্রুবকটির প্রয়োজন হয়েছিল কারন আমার জানার দরকার ছিল যে কি গতিবেগে সৌরজগৎ প্রসারিত হচ্ছে ও কতো আগে মঙ্গলের কক্ষপথ পৃথিবীর কক্ষপথের সমান ছিল। আমি ক্যালটেকের অধ্যাপক মার্টিন স্মিথের কাছে হাবল ধ্রুবকের মান জানতে চাই। মার্টিন স্মিথ হলেন বিখ্যাত পর্যবেক্ষক যিনি কোয়াসার আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন হাবল ধ্রুবকের মান 50 কিমি/সে/মেগাপারসেক (Mpc)। তিনি আরো জানিয়ে ছিলেন যে সূর্য কি হারে শক্তি বিকীরন করছে। যার সাহায্যে সূর্য ও মঙ্গলের মধ্যে মহাকর্ষ বলের পরিমান জানা যায়। আমি এই সমস্ত মান ব্যবহার করে একটা উত্তর বের করেছিলাম সেখান থেকে আমি নির্ণয় করতে পারতাম যে পৃথিবীতে কতদিন প্রাণের অস্তিত্ব থাকার মতন জলবায়ু বিদ্যমান হবে এবং এর উপর আমি একটা ছোট প্রবন্ধ লিখেছিলাম। সেটাই ছিল আমার প্রথম হাবল ধ্রুবক নিয়ে কিছু গানিতিক কাজকর্ম। যদিও আমি Cosmologist নই কিন্তু আমি সবসময়ই H_0 এর মান বা তৎসম্বন্ধিয় গবেষনার উপর নজর রাখতাম। খুব সম্প্রতি H_0 এর মান প্রায় 70 কিমি/সে/মেগাপারসেক পাওয়া গেছে। মানে গত 30 বছরে H_0-র মান প্রায় 40 % পরিবর্তিত হয়েছে !!!!

চিত্র - ১ :- এডুইন হাবল

হাবলের ধ্রুবক আসলে কি? এর মান নির্ণয় করা এত কঠিন কেন? আর সময়ের সাথে সাথে এর মান পাল্টে যাচ্ছে কেন? এই সব বিষয়ে এবার আমি আলোচনা করব।

হাবলের ধ্রুবককে সাধারণত H_0 দিয়ে সূচীত করা হয়। এটি হল একটি গতিবেগ, কত তাড়াতাড়ি একটি বস্তু মহাবিশ্বে তার থেকে 1 Mpc দূরত্বে অবস্থিত কোনো বস্তু থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। 1927 সালে এডুইন হাবল দেখিয়েছিলেন যে কাছাকাছি বস্তুরা তাদের একে অপরের থেকে V গতিবেগে দূরে সরে যাচ্ছে ও V এর মান তাদের মধ্যে দূরত্ব D এর সাথে সমানুপাতী,

$$V = H_0 D \qquad \text{---------- (1)}$$

একে হাবলের সূত্র বলা হয়। হাবল তার মহাজাগতিক মানগুলিকে ভেস্টো স্লিপারের লোহিত বিচ্যুতি (Red shift) সম্পর্কিত মহাজাগতিক মহাজাগতিক পরিমাপের সাথে একত্রিত করে দেন। এর ফলে Hubble বস্তু দূরত্বের সাথে লোহিত বিচ্যুতির একটি মোটামুটি অনুপাত আবিস্কার করেন। হাবল প্রায় 46 টি নক্ষত্রপুঞ্জকে পর্যবেক্ষন করে হাবল ধ্রুবকের মান 500 km/sec/Mpc নির্ণয় করেন। যেটি বর্তমানের গৃহীত মান অপেক্ষা অনেক বেশী। এই ত্রুটির মূল কারণ ছিল তার নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব নির্ধারনের মধ্যে ত্রুটি। 1 নং চিত্রে হাবলের ছবি দেখালাম ও ২ নং চিত্রে হাবলের গবেষণার ফল দেখালাম।

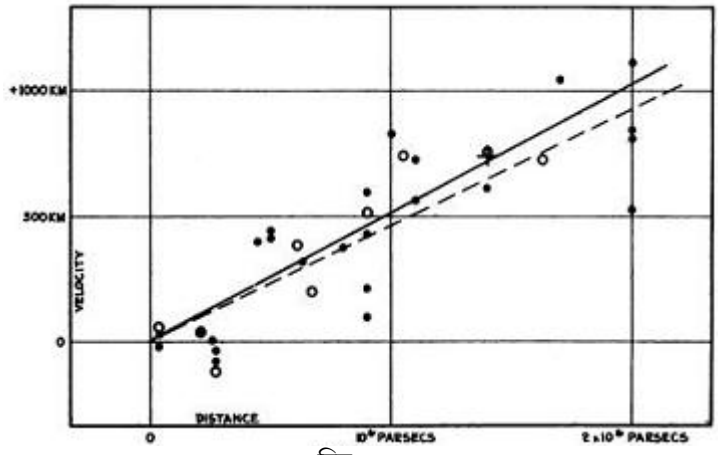

চিত্র - ২

নিকটবর্তী নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব নির্ধারনের সময় তিনি Cepheid তারাগুলি ব্যবহার করেছিলেন। এর মধ্যে কোনো নক্ষত্রের উজ্জলতার পরিবর্তনের হার ও নিরপেক্ষ ঔজ্জ্বল্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এজন্য Cepheid তারাকে কাজে লাগিয়ে কোনো নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব নির্ধারন করা সম্ভব।

হাবলের দূরত্ব পরিমাপের ত্রুটির জন্য H_0 এর একটি ত্রুটিপূর্ণ মান পাওয়া গেছিল। এবং তার পরই বিভিন্ন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকরা H_0 এর মান বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্ণয় করতে শুরু করেন। যেমন, সুনায়েভ - জেলডোভিচ্ এফেক্টের দ্বারা, মহাকর্ষীয় পরকলার দ্বারা, সুপারনোভা পরিমাপ ইত্যাদি।

3 নং চিত্র থেকে আমরা দেখতে পাই যে কিভাবে হাবল ধ্রুবক আস্তে আস্তে সঠিক থেকে সঠিকতর মান পেয়ে চলেছে।

হাবল ধ্রুবকের উপযোগীতা হল এর অনোন্যক থেকে মহাজগতের বয়স (T_u) নির্ণয় করা যায়। যেমন,

$H_0 = 70$ km/s/Mpc , $T_u = 13.7$ বিলিয়ন বছর

শেষ 30 বছরে H_0 এর মান 50 km/sec থেকে 70 km/sec হয়েছে। মানে মহাবিশ্বের বয়স 140 কোটি বছর থেকে 200 কোটি বছরের মধ্যে হতেই হবে।

এই গল্পের মধ্যে আবার একটি নতুন বাঁক আছে। Cepheid তারাটি মহাজাগতিক পরিমাপের জন্য খুবই উপযোগী, কিন্তু Cepheid নক্ষত্রগুলি খুবই অনুজ্জ্বল হবার জন্য লোহিত বিচ্যুতি হবার জন্য উপযুক্ত নয়। 1A প্রকারের সুপারনোভা হল একটি তাপ-নিউক্লিয় বিস্ফোরণ যেটি কেবল অক্সিজেন ও কার্বন সমৃদ্ধ শ্বেত বামন নক্ষত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় এবং এদের ভর 1.4 গুণ সৌরভর হয়ে থাকে (চন্দ্রশেখর সীমা)। ঐ বিস্ফোরণের ঔজ্জ্বল্যকে প্রমান হিসাবে আমরা ধরতে পারি। সেজন্য আজকাল বৈজ্ঞানিকরা সুপারনোভা বিস্ফোরনকে দেখে লোহিত বিচ্যুতি নির্ণয় করছেন। দেখা গেছে যে সুপারনোভার দূরের অংশটি যেটি লোহিত বিচ্যুতির সেটি যতটা আশা করা হয়েছিল তার চেয়েও বেশী ক্ষীণ। এর থেকে বলা যায় যে মহাবিশ্বের বিবর্ধনের হার সমান নয় ও মহাবিশ্বের বিবর্ধন দিনে দিনে আরও ত্বরাণ্বিত হচ্ছে। তার মানে হাবলের রৈখিক বিবর্ধন সূত্রটি কেবল নিকটবর্তী বস্তুদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য ও দূরবর্তী বস্তুর জন্য ঐ সূত্র কার্যকরী নয়। এর থেকেও প্রমাণিত হয় মহাবিশ্ববৃদ্ধি কেবল 50-70 কোটি বছর আগে ত্বরাণ্বিত হতে শুরু করেছে। এর ফলে বৈজ্ঞানিকদের সামনে নতুন সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যে সব সূত্র ও তত্ত্ব ঐ উদ্ভট মানের সাথে সামন্জস্য রেখে পরিবর্তন করতে হবে।

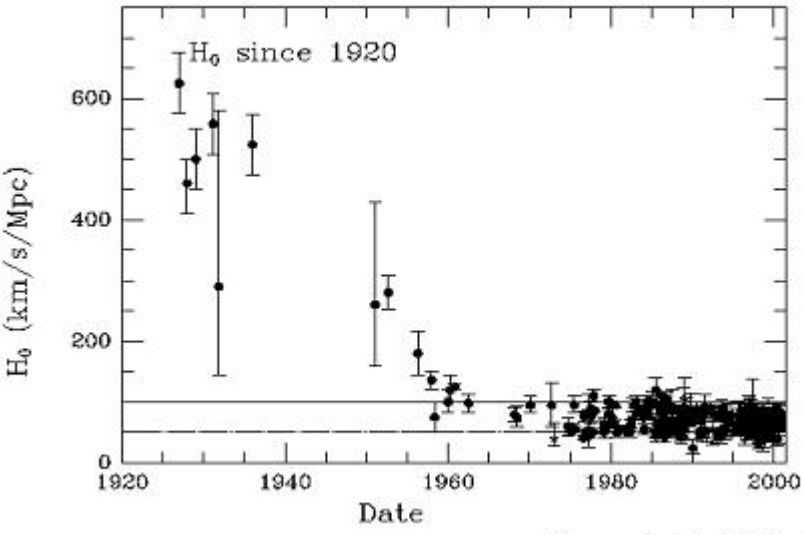

চিত্র - ৩

তারা বলছেন যে হয়তো কোনো মহাজাগতিক বিকর্ষনকারী বস্তু আছে যা আসলে মহাবিশ্বের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করছে। যাকে তারা ডার্ক এনার্জি বলে অভিহিত করেছেন । এই অদৃশ্য শক্তি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা এখনও কেউ দিতে পারেননি ও মোট শক্তির 2/3 অংশই হলো এই অদৃশ্য শক্তি ।